থ্যালাসিমিয়া কি?

DSHTC

ঢাকা শিশু হাসপাতাল থ্যালাসিমিয়া সেন্টার

Dhaka Shishu Hospital Thalassaemia Centre

প্রকাশক : প্রফেসর মোঃ সেলিমুজ্জামান
প্রকাশনা বোর্ড : প্রফেসর ওয়াকার আহ্‌মেদ খান
: প্রফেসর বিলকিস বানু
: বেলায়েত হোসেন

প্রকাশকাল :
জানুয়ারী-২০১৪
পঞ্চম সংস্করণ

মুদ্রণে :
ঝর্ণা অফসেট প্রেস
মিরপুর-১০নং গোলচক্কর, ঢাকা-১২১৬
মোবাঃ ০১৯২৩৬৭৮৫৫৮

ঢাকা শিশু হাসপাতাল থ্যালাসিমিয়া সেন্টার

এর

সদস্যবৃন্দ

সভাপতি ঃ প্রফেসর ওয়াকার আহ্‌মেদ খান
মহাসচিব ঃ প্রফেসর মোঃ সেলিমুজ্জামান
কোষাধ্যক্ষ ঃ প্রফেসর বিলকিস বানু

সদস্য ঃ

ডাঃ বেলায়েত হোসেন
মিঃ গোলাম সরোওয়ার্দী
ডাঃ সালমা সাদিয়া
ডাঃ আলমগীর আহমেদ
ডাঃ জান্নাত নূর
ডাঃ ইয়াছির রহমান
ডাঃ দিলারা সুলতানা
ডাঃ বিভা রাণী মন্ডল
মিঃ শামীম ভূঁইয়া
মিঃ সফিকুল ইসলাম
জুঁই কাঁকন কস্টা
হিরা সুলতানা
কামরুন নাহার মুকুল
বীথি খাতুন

প্রফেসর মঞ্জুর হোসেন
প্রফেসর এ. আর. খান
ডাঃ মোঃ মিজানুর রহমান
ডাঃ জোৎস্না আরা বেগম
ডাঃ এইচ. এম. কামরুল আলম
ডাঃ নিলুফার আক্তার বানু চৌধুরী
ডাঃ মোঃ আব্দুল ওহাব
ডাঃ হাসান মেহেদী
ডাঃ ফজলুর রহমান চৌধুরী
ডাঃ আসমা হক
ডাঃ ইসরাত জাহান এ্যানি
ডাঃ জেসমিন আক্তার
ডাঃ নওশিকা শারমনি ইকো

"ঢাকা শিশু হাসপাতাল" একটি বেসরকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। এখানে শিশুদের সবধরনের চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং গরীব রোগীদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয়। সমগ্র বাংলাদেশ থেকে শিশুরা এখানে আসে সুচিকিৎসার জন্য। এই চিকিৎসার পাশাপাশি এখানে কিছু নিবেদিতপ্রাণ, পরিশ্রমী ও উদ্যোগী ডাক্তারের চেষ্টায় **১৯৯৮** সালে থ্যালাসিমিয়া কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে- যার নাম দেওয়া হয়েছে **"ঢাকা শিশু হাসপাতাল থ্যালাসিমিয়া সেন্টার" (Dhaka Shishu Hospital Thalassaemia Centre)**। এই কেন্দ্রে উদ্দেশ্য হল ঃ

১। জনগণের মধ্যে এই রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রচারণা চালানো।

২। জনসাধারণের মধ্যে এই রোগ চিহ্নিত করার জন্য স্ক্রীনিং টেষ্ট (Screening Tests) এর ব্যবস্থা করা।

৩। হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার এর বাহক এবং আক্রান্ত রোগীদের বংশ বিষয়ক (Genetic Counselling) পরামর্শ দেওয়া।

৪। আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসার পাশাপাশি নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন করা (Safe blood Transfusion) এবং নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ (Follow up) করা।

৫। স্বল্পমূল্যে থ্যালাসিমিয়া রোগীদের মধ্যে হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস (Hepatitis B Virus) এর ভ্যাকসিন সরবরাহ করা।

৬। প্রি-নেটাল ডায়াগনোসিস (Pre-natal Diagnosis) ও ডি.এন.এ. (DNA Analysis) এনালাইসিস সেন্টার স্থাপন করা। এই সেন্টার স্থাপন করার কাজ চলছে এবং শীঘ্রই চালু হবে।

এই কেন্দ্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য দরকার প্রচুর অর্থ এবং সকলের আন্তরিক প্রয়াস ও প্রচেষ্টা। যদি দেশের সরকার,বিত্তশীল গোষ্ঠী ও দাতা সংস্থা এগিয়ে আসে এবং সবার আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যায়, তবে এই রোগীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসবে এবং হয়তো একদিন প্রায় প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়ে উঠবে। এটাই হোক-আমাদের এ শতাব্দীর অঙ্গীকার।

ঢাকা শিশু হাসপাতাল থ্যালাসিমিয়া সেন্টার
(Dhaka Shishu Hospital Thalassaemia Centre)

থ্যালাসিমিয়া সম্বন্ধে মূল কথা ঃ

- থ্যালাসিমিয়া হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার (Hb Disorder) জনিত একটি বংশগত (Genetic) রোগ।
- পিতা-মাতা থেকে সন্তানদের মধ্যে জিন (Gene) এর মাধ্যমে প্রবেশ করে। এজন্য তাদেরকে বাহক বলা হয়।
- পিতা-মাতা উভয়েই বাহক হলে থ্যালাসিমিয়া শিশুর জন্ম হবার সম্ভাবনা থাকে, নতুবা নয়।
- পিতা-মাতার একজন বাহক হলে এবং অন্যজন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষ হলে থ্যালাসিমিয়া শিশুর জন্ম হবে না।
- বিয়ের আগে সবারই রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া দরকার তারা বাহক কিনা ?
- যারা বাহক হবে তারা কখনোই অন্য একজন বাহককে বিয়ে করবে না। তাহলেই থ্যালাসিমিয়া শিশুর জন্ম প্রতিরোধ করা সম্ভব।
- বাহক কোন সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ নয়। এত নিজেকে লজ্জিত বা অপরাধী ভাবার কিছুই নেই।
- যারা বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহক (Beta Thalassaemia Trait) কিংবা হিমোগ্লোবিন-ই এর বাহক (Hb E Trait) তাদের কোন উপসর্গ (Symptoms) থাকে না। সুস্থ মানুষের মত দিন যাপন করে।
- কোন রকম চিকিৎসা দ্বারা বাহকের পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। বাহক হয়ে জন্ম গ্রহণ করলে সারা জীবন তা বহন করতে হবে।
- বাংলাদেশে বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহক হল ৪.১% এবং হিমোগ্লোবিন-ই এর বাহক হল ৬.১%।

বাংলাদেশে থ্যালাসিমিয়া রোগের ইপিডেমিওলজিক্যাল ডাটা (Epidemiological data)

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা (২০০২ সালের আদমশুমারী অনুসারে)................ : ১২৩.৮৫ মিলিয়ন

জন্ম হার/১০০০ .... : ২০

মোট বাৎসরিক জন্ম গ্রহণ..................................... : ২৪,৭৭,০২২

বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহক এর শতকরা হার.................. : ৪.১%

প্রতি বছর সম্ভাব্য বিটা থ্যালাসিমিয়া মেজর শিশুর জন্ম .... : ১,০৪০

সমগ্র বাংলাদেশে সম্ভাব্য বিটাথ্যালাসিমিয়া মেজর রুগীর সংখ্যা................. : ৫০,০১৭

হিমোগ্লোবিন-ই বাহক এর শতকরা হার..................... : ৬.১%

বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহক এবং হিমোগ্লোবিন-ই বাহক এর একত্রিত শতকরা হার...... : ১০.২%

প্রতি বছর সম্ভাব্য হিমোগ্লোবিন-ই বিটা থ্যালাসিমিয়া শিশুর জন্ম .... : ৬,৪৪৩

সমগ্র বাংলাদেশে সম্ভাব্য হিমোগ্লোবিন-ই বিটা থ্যালাসিমিয়া রুগীর সংখ্যা .... : ৩,২২,১৩৭

Reference

Khan WA, Babu B, Amin SK, Selimuzzaman M, Rahman M et al. Prevalence of Beta Thalassaemia trait and Hb E trait in Bangladeshi school chaldren and health burden of Thalassaemia in our population. DS (child) H J, 2005; 21 (I) : 1-6.

থ্যালাসিমিয়া
এবং
হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার

ভূমিকা ঃ

হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার সম্পর্কে কোন কিছু বলতে গেলে প্রথমেই যেটা মনে আসে তা হল হিমোগ্লোবিন জিনিসটা কি ? কোথায় থাকে এবং এর প্রয়োজনীয়তা কি ? সংক্ষেপে বলতে গেলে হিমোগ্লোবিন হচ্ছে এক প্রকার লৌহ মিশ্রিত লাল পদার্থ, যা আমাদের রক্তের লোহিত কণিকার (Red blood Cell) মধ্যে থাকে এবং শরীরের বিভিন্ন কোষে (Cell) অক্সিজেন (O_2) সরবরাহ করে এবং কোষগুলিকে সক্রিয় রাখে। শরীরের সমস্ত কোষগুলি সক্রিয় থাকে বলেই আমরা সুস্থ থাকি। সুতরাং হিমোগ্লোবিনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়।

যদি কোন কারণে এই হিমোগ্লোবিনের গঠন প্রণালীতে কোন গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে যে অসুখ হয়, চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষায় তাকে **"হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার" (Haemoglobin Disorder)** বলে। এটা বংশগত রোগ (Hereditary Disease)। পিতা-মাতার মধ্যে দিয়ে সন্তানদের মধ্যে এটা প্রবেশ করে। যে বংশে এই রোগ আছে, সেই বংশের লোকজনই বংশানুক্রমে এটা বহন করে। পিতা-মাতা থেকে সন্তানদের মধ্যে যার মাধ্যমে এটা প্রবেশ করে তাকে জিন (Gene) বলে। এটা কোন ছোয়াঁচে বা সংক্রামক রোগ নয়। একজনের কাছ থেকে অন্যজনের মধ্যে বাতাস খাবার পানীয়, কাপড় ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়ায় না।

হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার অনেক ধরনের আছে যথা- বিটা থ্যালাসিমিয়া(Beta-Thalassaemia), আলফা থ্যালাসিমিয়া (Alpha-Thalassaemia), হিমোগ্লোবিন-ই (Haemoglobin-E), হিমোগ্লোবিন-এস (Haemoglobin-S), হিমোগ্লোবিন-সি (Haemoglobin-C), হিমোগ্লোবিন-ডি পাঞ্জাব (Haemoglobin-D Punjab), ইত্যাদি। পৃথিবীর সকল দেশে এই রোগ ছড়িয়ে আছে। তবে থ্যালাসিমিয়া বেশী দেখা যায় দক্ষিণ - পূর্ব এশিয়ায় এবং ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে

হিমোগ্লোবিন-ই বেশী দেখা যায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। হিমোগ্লোবিন-এস এবং হিমোগ্লোবিন-সি বেশী দেখা যায় আফ্রিকা মহাদেশের গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে এবং আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে। আর হিমোগ্লোবিন-ডি পাঞ্জাব সাধারণতঃ বেশী দেখা যায় পাকিস্তান, ইরান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে। ভৌগলিক বন্টন অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে বিটা-থ্যালাসিমিয়া এবং হিমোগ্লোবিন-ই ডিসঅর্ডার বেশী। এর প্রমাণও আমরা পেয়েছি ঢাকা শিশু হাসপাতালের প্রতিবেদনে (Report)। তাই বলা যায়, এটা একটা বড় ধরনের সমস্যা এবং এর থেকে মুক্তি পেতে হলে দেশের প্রতিটি নাগরিককে এই রোগ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে এবং সেই অনুসারে পদক্ষেপ নিতে হবে।

হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার এর মধ্যে যেহেতু বিটা থ্যালাসিমিয় এবং হিমোগ্লোবিন-ই ডিসঅর্ডার আমাদের দেশে বেশী দেখা যায়, তাই সংক্ষেপে এই রোগ সম্বন্ধে নীচে আলোকপাত করা হল-

বিটা থ্যালাসিমিয়া (Beta Thalassaemia) ঃ আগেই বলা হয়েছে এটা এক ধরনের হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার এবং বংশগত রোগ। পিতা-মাতা থেকে সন্তানদের মধ্যে যে জিনের (Gener) মাধ্যমে এটা প্রবেশ করে, সেই জিনকে বিটা থ্যালাসিমিয়া জিন (Beta Thalassaemia Gener) বলে।

বিটা থ্যালাসিমিয়া তিন ধরনের ঃ

১। বিটা থ্যালাসিমিয়া মেজর (Beta Thalassaemia Major)

২। থ্যালাসিমিয়া ইন্টারমিডিয়া (Thalassaemia Intermedia)

৩। বিটা থ্যালাসিমিয়া মাইনর (Beta Thalassaemia Minor) বা বিটা থ্যালাসিমিয়া ট্রেইট অথবা বাহক (Beta Thalassaemia Trait or Carrier)

বিটা থ্যালাসিমিয়া মেজর (Beta Thalassaemia Major) ঃ

এদের পিতা-মাতা উভয়েরই বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহক (Beta Thalassaemia Trait) এবং উভয়ের কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে বিটা থ্যালাসিমিয়া জিন প্রাপ্তি হয় বলে এদেরকে বিটা থ্যালাসিমিয়া মেজর বলা হয়। ছোটবেলা থেকেই এরা ভীষণ রক্তস্বল্পতায় (Severe Anaemia) ভুগে। শিশু যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন রক্তশূন্যতা দেখা দেয় না। এই রোগের লক্ষণ সাধারণতঃ তিন মাস বয়স থেকে আঠারো মাসের মধ্যে দেখা দেয়। শিশু আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে (Pale) ও দুর্বল হয়ে পড়ে, ঘুমাতে পারে না, খেতে পারে না, খাবার পরে বমি করে। রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ৩-৫ গ্রাম / ডেসিলিটার এ নেমে আসে, জন্ডিস দেখা দিতে পারে, যকৃত (Liver) ও প্লীহা (Spleen) আস্তে আস্তে বড়

হতে থাকে, ফলে এদের পেটও বড় হতে থাকে। মুখমন্ডলের পরিবর্তনও (Thalassaemic Facies) এ সময় দেখা দেয়। যদি চিকিৎসা করা না হয়, তবে ৫-৬ বছরের মাথায় শিশুর মৃত্যু বরণ করার সম্ভাবনা থাকে। যদি শুধু রক্ত সঞ্চালন (Blood Transfusion) দ্বারা চিকিৎসা করা হয় তবে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচে। আর যদি নিয়মিত রক্ত সঞ্চালনের পাশাপাশি লৌহ অপসারণকারী ঔষধ (Iron Chelating) দিয়ে চিকিৎসা করা হয় তবে প্রায় স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করবে।

থ্যালাসিমিয়া ইন্টারমিডিয়া (Thalassaemia Intermedia) ঃ

এদের অবস্থান থ্যালাসিমিয়া মেজর এবং মাইনর এর মাঝামাঝি। অর্থাৎ এদের যে উপসর্গ দেখা দেয় তা থ্যালাসিমিয়া মেজর এর মত ভয়াবহ আকার ধারণ করে না আবার থ্যালাসিমিয়া মাইনরের চেয়ে বেশী হয়। এদের রোগের লক্ষণ ২ থেকে ৬ বছরের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং সাধারণত ঃ কখনও কখনও থ্যালাসিমিয়া মেজর এর মত সব উপসর্গ দেখা দিলেও এদের প্রকটতা অত মারাত্মক রূপ ধারণ করে না। এদের যে রক্তস্বল্পতা হয়, তার জন্য ঘন ঘন রক্ত দিয়ে চিকিৎসা করার দরকার পড়ে না, মাঝে মাঝে রক্ত সঞ্চালনের দরকার পড়ে। এজন্য এদেরকে থ্যালাসিমিয়া ইন্টারমিডিয়া বলে।

বিটা থ্যালাসিমিয়া মাইনর (Beta Thalassaemia Minor) ঃ

এরা পিতা কিংবা মাতা যে কোন একজনের কাছ থেকে বিটা থ্যালাসিমিয়া জিন পায় বলে এদেরকে বিটা থ্যালাসিমিয়া মাইনর বা বিটা থ্যালাসিমিয়া ট্রেইট (Thalassaemia Minor or Trait) বলা হয়। এরা সুস্থ বহনকারী (Healthy Carrier) এবং এদের কোন উপসর্গ দেখা দেয় না, কাজ কর্ম করতে কোন অসুবিধা হয় না এবং স্বাভাবিকভাবে দিন যাপন করে। তবে এরা সামান্য রক্তস্বল্পতায় ভুগতে পারে এবং সেই কারনে অনেক সময় লৌহ এর অভাবজনিত রক্তস্বল্পতার (Iron Deficiency Anaemia) সঙ্গে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই এক্ষেত্রে অবশ্যই হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস অথবা এইচ, পি,এল, সি (Hb Electrophoresis or HPLC) করে বাহককে চিহ্নিত করা দরকার। কারন বাহককে দীর্ঘমেয়াদী লৌহ (Iron) দিয়ে চিকিৎসা করা হলে ভবিষ্যতে তার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, যেহেতু বিটা থ্যালাসিমিয়া জিন সারা জীবনের জন্য বহন করে, পরবর্তী সময়ে সন্তানদের মধ্যে এটা প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবেই বংশ পরম্পরায় বিটা থ্যালাসিমিয়া বিস্তার লাভ করে। এ কারণেই এটা গুরত্বপূর্ণ।

হিমোগ্লোবিন-ই ডিসঅর্ডার (Hb-E Disorder) ঃ

বিটা থ্যালাসিমিয়ার মত হিমোগ্লোবিন-ই ও আমাদের দেশে বেশ দেখা যায়। এটাও এক ধরনের হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার এবং বংশগত রোগ। এটা দুই ধরনের হয় ঃ

১। হিমোগ্লোবিন-ই ট্রেইট (Hb-E Trait or Carrier)
২। হিমোগ্লোবিন-ই ডিজিজ (Hb-E Disease)

যারা পিতা কিংবা মাতা যে কোন একজনের কাছ থেকে হিমোগ্লোবিন-ই জিন পায়, তাদেরকে হিমোগ্লোবিন-ই বাহক (Hb-E Trait or Carrier) বলা হয়। আর যারা উভয়ের কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে এই জিন পায় তাদেরকে হিমোগ্লোবিন-ই ডিজিজ বলা হয়। যারা হিমোগ্লোবিন-ই এর বাহক কিংবা হিমোগ্লোবিন-ই ডিজিজ-এ আক্রান্ত উভয়েরই কোন উপসর্গ দেখা দেয় না। তবে হিমোগ্লোবিন-ই ডিজিজরা সামান্য রক্তস্বল্পতায় ভুগতে পারে। তাই তারাও বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহকের (Beta Thalassaemia Trait) মত স্বাভাবিকভাবে দিন যাপন করে। যেহেতু এরাও হিমোগ্লোবিন-ই জিন সারা জীবনের জন্য বহন করে, পরবর্তী সময়ে সন্তানদের মধ্যে এটা প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে। এভাবে বংশ পরম্পরায় এই রোগও বিস্তার ভাল করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি এদের সাথে বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহকের বিবাহ হয়, তবে হিমোগ্লোবিন-ই বিটা থ্যালাসিমিয়া (Hb-E Beta Thalassaemia) শিশুর জন্ম হবার সম্ভাবনা থাকে।

হিমোগ্লোবিন-ই বিটা থ্যালাসিমিয়া (Hb-E Beta Thalassaemia) ঃ

আমাদের দেশে বিটা থ্যালাসিমিয়া থেকে হিমোগ্লোবিন-ই বিটা থ্যালাসিমিয়া রোগীর সংখ্যা অনেক বেশী যা আগেই বলা হয়েছে।

রোগের লৰণ এবং প্রকটতাভেদে হিমোগ্লোবিন-ই বিটা থ্যালাসিমিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

(ক) অল্প হিমোগ্লোবিন-ই বিটা থ্যালাসিমিয়া (Mild Hb - E Beta Thalassaemia) ঃ এ গ্রুপের মধ্যে পড়ে প্রায় ১৫% রোগী এবং এদের হিমোগ্লোবিনের (Hb) পরিমাণ ৯-১২.০ গ্রাম/ডেসিলিটার এর মধ্যে থাকে। এরা সুস্থ শিশুর মত ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে এবং প্রায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। এদের রক্ত গ্রহণেরও প্রয়োজন হয় না। তবে এরা সামান্য রক্তস্বল্পতায় ভূগে বলে অনেক সময় লৌহ এর অভাবজনিত রক্তস্বল্পতার (Iron deficiency anaemia) সঙ্গে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস পরীক্ষা না করে রোগীকে লৌহ দিয়ে চিকিৎসা করা ঠিক হবে না। তারা যে রক্তস্বল্পতায় ভুগে তা লৌহ এর অভাবে হয় না। ফলে লৌহ দিলে রোগীর লাভ তো হবেই না বরং ক্ষতিই হবে বেশী।

(খ) মাঝারী হিমোগ্লোবিন ই-বিটা থ্যালাসিমিয়া (Modreate Hb-E Beta Thalassaemia) : অধিকাংশ রোগীই এ গ্রবপের মধ্যে পড়ে। এদের রক্তে হিমোগ্লোবিন (Hb) এর পরিমাণ সাধারণত ৬-৭.০গ্রাম/ডেসি লিটার এর মধ্যে থাকে। এদের রোগের লৰণ বিটা থ্যালাসিমিয়া ইন্টামিডিয়া (Beta Thalassaemia Intermedia) এর মতো। এদের সব সময় রক্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। যদি কোন কারণে এদের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ আরও কমে যায়, যেমন ইনফেকশন কিংবা অন্য কোন অসুখের দ্বারা) তাহলে অবশ্যই রক্ত দিতে হবে। এদের ক্ষেত্রে রক্তে লৌহের (Iron) পরিমাণ বেশী হতে পারে এবং সেৰেত্রে রক্তে লৌহের পরিমাণ যদি নির্দিষ্ট মাত্রার বেশী থাকে (>১০০০ ন্যানোগ্রাম/মিলিলিটার) তাহলে অবশ্যই অতিরিক্ত লৌহ অপসারণ করার জন্য ঔষধ (Chelating Agents) ব্যবহার করতে হবে।

(গ) মারাত্মক হিমোগ্লোবিন ই-বিটা থ্যালাসিমিয়া (Severe Hb-E Beta Thalassaemia) এদের লক্ষণ গুলো বিটা থ্যালাসিমিয়া মেজর (Beta Thalassaemia Major) এর মতোই হয়। এরা ছোটবেলা থেকেই মারাত্মক রক্তস্বল্পতায় ভুগতে থাকে, রক্তে হিমোগ্লোবিনের (Hb) পরিমাণ ৪-৫.০ গ্রাম/ডিসিলিটার-এ নেমে আসে এবং এর ফলে এদের স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এরাও সাধারণতঃ জন্ডিস (Jundice) এ আক্রান্ত হয়, যকৃত (Liver) এবং প্লীহা (Spleen) আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে মুখমন্ডলের পরিবর্তনও (Thalassaemic Facies) দেখা দেয়। এদেরকে সব সময়েই নিয়মভাবে রক্ত গ্রহণ করতে হয় এবং অন্যান্য চিকিৎসা প্রণালীও বিটা থ্যালাসিমিয়া মেজরের (Beta Thalassaemia Major) মতোই।

কেউ হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার এর বাহক বা রোগাক্রান্ত হলে, তা কেমন করে জানা যাবে ?

এটা জানতে হলে, রক্তে বিশেষ ধরনের পরীক্ষা আছে। যে মেশিন দিয়ে এই পরীক্ষা করা হয় তার নাম হল হিমোগ্লোবিন ইলেট্রোফোরেসিস (Hb Electrophoresis) অথবা High Performance Liquid Chromatography (HPLC) মেশিন। এই পরীক্ষার দ্বারা আমরা বলতে পারি কারা এই রোগের বাহক, কারা এই রোগে আক্রান্ত আর কারাই বা এই রোগ থেকে মুক্ত আছে।

* আমাদের দেশে সাধারণতঃ যে সমস্ত হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার বেশী দেখা যায় যথা- বিটা থ্যালাসিমিয়া এবং হিমোগ্লোবিন-ই ডিসঅর্ডার এর বংশানুক্রমিক বিকাশের (Pedigree Chart) নকশা নীচে দেওয়া হল ঃ-

১. মাতা কিংবা পিতার মধ্যে যদি একজন সুস্থ হয় এবং অন্যজন থ্যালাসিমিয়া বাহক হয়, তবে সন্তান হবে নিম্নরূপ ঃ-

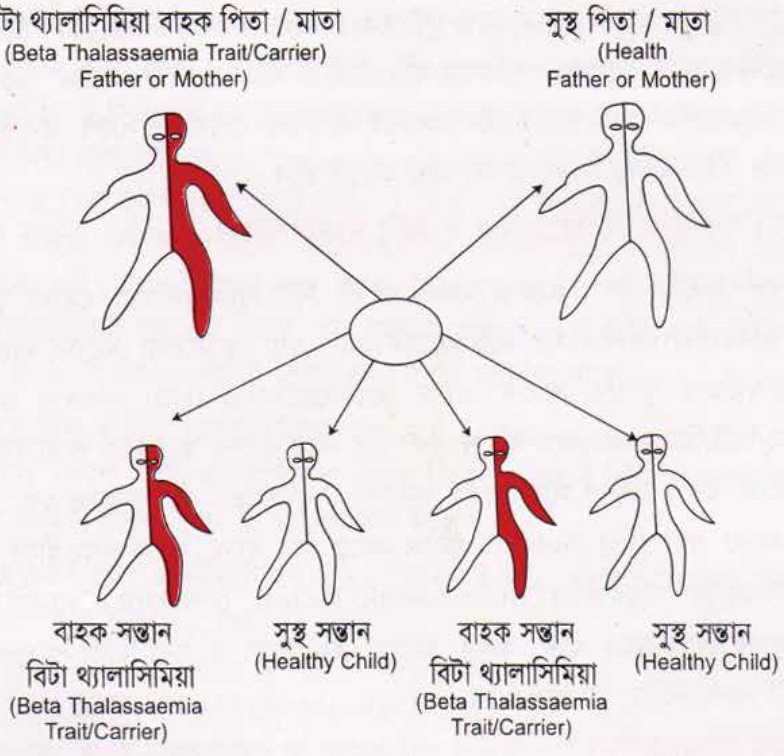

সুতরাং মায়ের প্রতিটি গর্ভাবস্থায় সন্তান সম্ভাবনা দুই ধরনের ঃ

(১) সন্তান সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে জন্ম নিতে পারে (৫০%)

(২) সন্তান বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহক হয়ে জন্ম নিতে পারে (৫০%), যা ক্ষতিকারক নয় এবং এরা স্বাভাবিকভাবে দিন যাপন করে।

২। যদি মাতা এবং পিতা উভয়েই বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহক হয়, তবে সন্তান হবে নিম্নরূপ ঃ

বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহক পিতা কিংবা মাতা
(Beta Thalassaemia Trait/Carrier Father or Mother)

বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহক পিতা কিংবা মাতা
(Beta Thalassaemia Trait/Carrier Father or Mother)

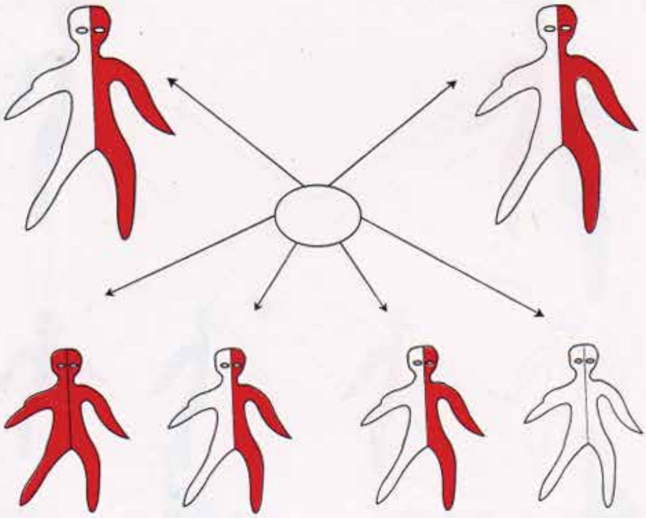

আক্রান্ত সন্তান
বিটা থ্যালাসিমিয়া
(Beta Thalassaemia Major)

বাহক সন্তান
বিটা থ্যালাসিমিয়া
(Beta Thalassaemia Trait/Carrier)

সুস্থ সন্তান
(Healthy Child)

এখানে মায়ের প্রতিটি গর্ভবস্থায় সন্তান সম্ভাবনা চার রকমের ঃ

(১) সন্তান সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে জন্ম নিতে পারে (২৫%)

(২) সন্তান বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহক হয়ে জন্ম নিতে পারে (৫০%), যা ৰতিকারক নয় এবং এরা সুস্থভাবে দিন যাপন করে।

(৩) সন্তান, পিতা ও মাতা উভয়ের কাছথেকেই এই রোগ উত্তরাধিকার সূত্রে ধারণ করে এবং বিটা থ্যালাসিমিয়া মেজর রোগে আক্রান্ত হয়ে জন্ম নিতে পারে (২৫%)। যা অত্যান্ত মারাত্মক ব্যাধি এবং এর পরিণতিও ভয়াবহ।

৪১৮ যদি পিতা এবং মাতার মধ্যে একজন বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহক হয়, অন্যজন হিমোগ্লোবিন-ই বাহক হয় তবে সন্তান হবে নিম্নরূপ ঃ

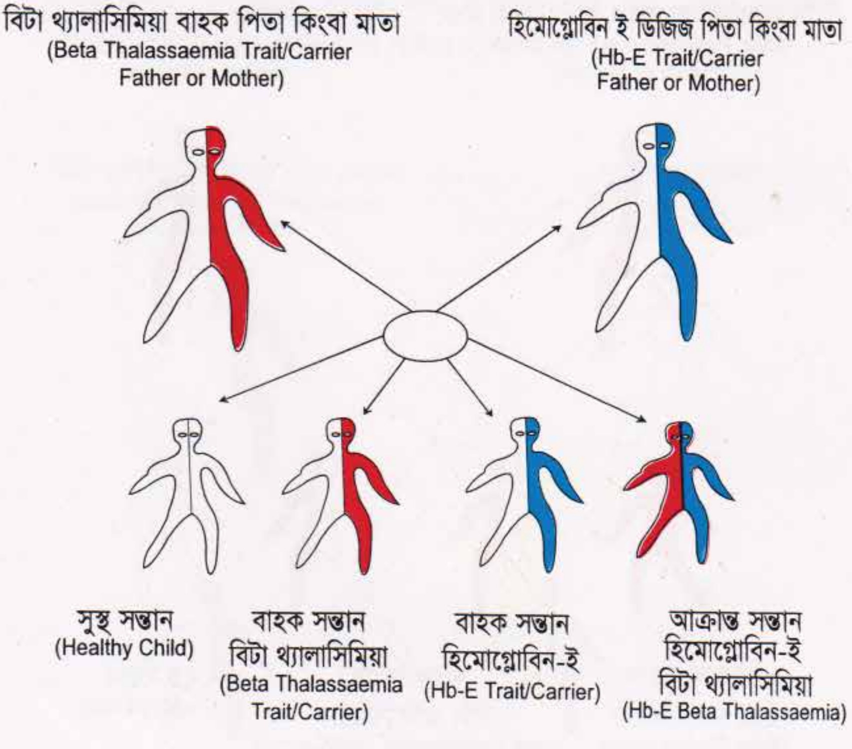

এখানে মায়ের প্রতিটি গর্ভবস্থায় সন্তান সম্ভাবনা চার রকমের ঃ

(১) সন্তান সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে জন্ম নিতে পারে (২৫%)

(২) সন্তান বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহক হয়ে জন্ম নিতে পারে (২৫%), যা ক্ষতিকারক নয় এবং এরা সুস্থভাবে দিন যাপন করে।

(৩) সন্তান হিমোগ্লোবিন-ই বাহক হয়ে জন্ম নিতে পারে (২৫%), ইহাও ক্ষতিকারক নয় এবং এরাও স্বাভাবিকভাবেই দিন যাপন করবে।

(৪) সন্তান, পিতা ও মাতা উভয়ের কাছথেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে এই রোগ ধারণ করে এবং হিমোগ্লোবিন-ই বিটা থ্যালাসিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে জন্ম নিতে পারে (২৫%) ।

৪। যদি পিতা কিংবা মাতার মধ্যে একজন হিমোগ্লোবিন-ই বাহক এবং অন্যজন সুস্থ হয়, তবে সন্তান হবে নিম্নরূপ ঃ

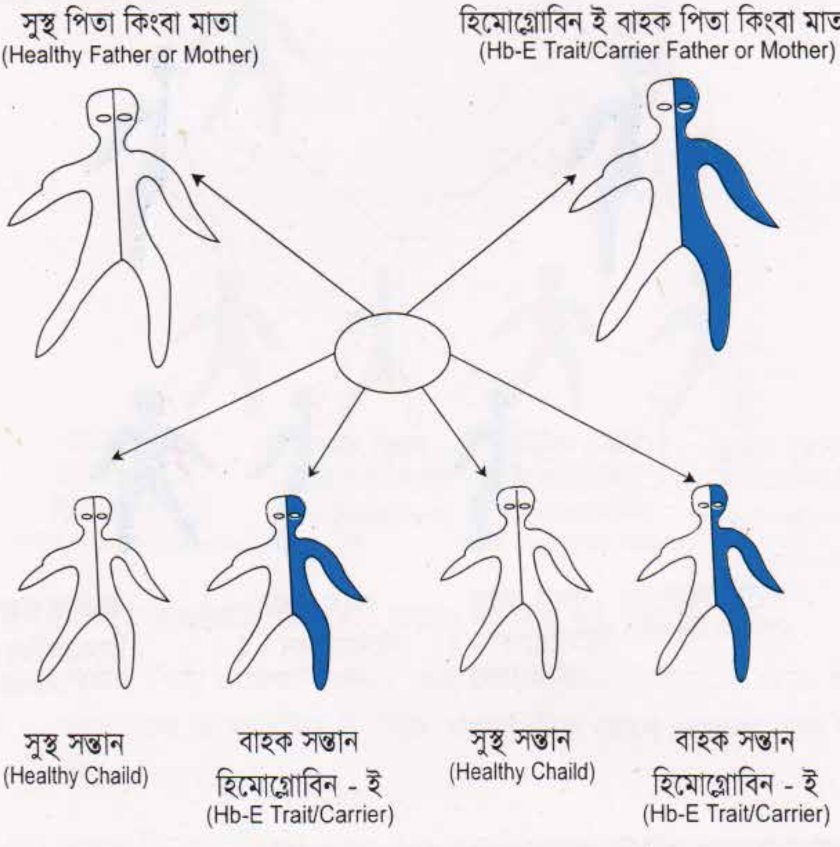

এখানে মাতার প্রতিটি গর্ভাবস্থায় সন্তান সম্ভাবনা দুই রকমের ঃ

(১) সন্তান সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে জন্ম নিতে পারে (৫০%)

(২) সন্তান হিমোগ্লোবিন-ই বাহক হয়ে জন্ম নিতে পারে (৫০%)। যা ক্ষতিকারক নয় এবং এরাও স্বাভাবিকভাবে দিন যাপন করবে।

৫। যদি পিতা এবং মাতা উভয়েই হিমোগ্লোবিন-ই বাহক হয়, তবে সন্তান হবে নিম্নরূপ

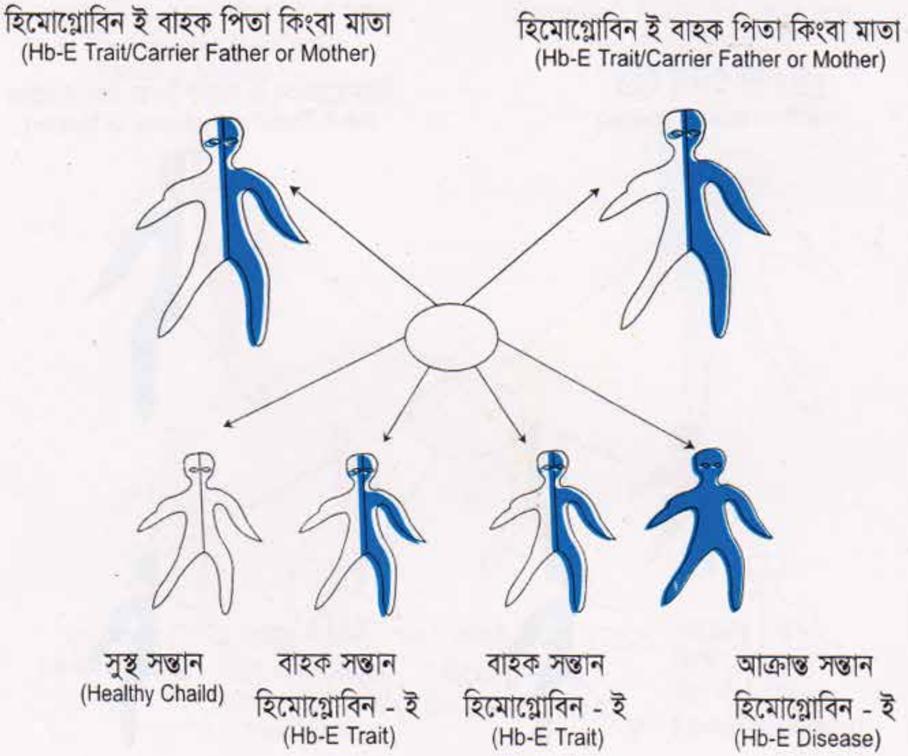

এখানে মাতার প্রতিটি গর্ভাবস্থায় সন্তান সম্ভাবনা তিন ধরনের ঃ

(১) সন্তান সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে জন্ম নিতে পারে (২৫%)

(২) সন্তান হিমোগ্লোবিন-ই বাহক হয়ে জন্ম নিতে পারে (৫০%), যা ক্ষতিকারক নয় এবং এরা স্বাভাবিকভাবেই দিন যাপন করবে।

(৩) সন্তান, পিতা ও মাতা উভয়ের কাছথেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে এই রোগ ধারণ করে এবং হিমোগ্লোবিন-ই রোগে আক্রান্ত হয়ে জন্ম নিতে পারে (২৫%) এবং ক্ষতিকারক নয়।

৬। যদি পিতা এবং মাতার মধ্যে একজন হিমোগ্লোবিন-ই ডিজিজ হয় এবং অন্যজন বিটা থ্যালাসিমিয়া বাহক হয়, তবে সন্তান হবে নিম্নরূপ ঃ

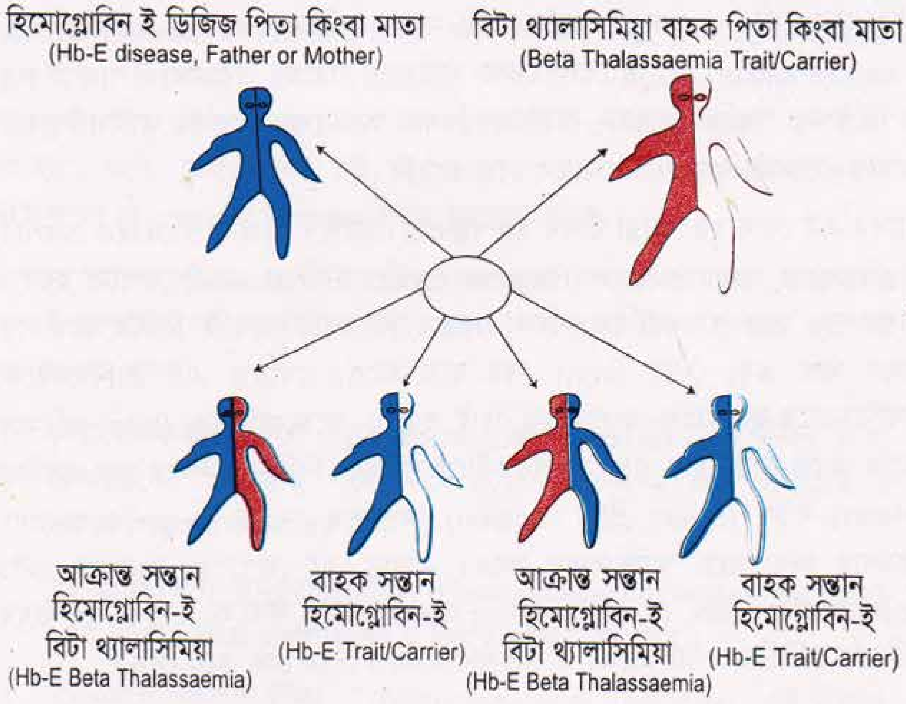

এখানে মাতার প্রতিটি গর্ভাবস্থায় সন্তান সম্ভাবনা দুই রকমের ঃ

(১) সন্তান, পিতা ও মাতা উভয়ের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে রোগ ধারণ করে এবং হিমোগ্লোবিন-ই বিটা থ্যালাসিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে জন্ম নিতে পারে (৫০%)।

(২) সন্তান হিমোগ্লোবিন-ই বাহক হয়ে জন্ম নিতে পারে (৫০%),যা ক্ষতিকারক নয় এবং এরা স্বাভাবিকভাবেই দিন যাপন করবে।

যারা বিটা থ্যালাসিমিয়া মেজর (Beta Thalassaemia Major) কিংবা হিমোগ্লোবিন-ই বিটা থ্যালাসিমিয়া (Hb-E Beta Thalassaemia) অসুখে আক্রান্ত তাদের কোন চিকিৎসা আছে কি ?

সত্যিকার অর্থে এখনও পর্যন্ত অস্থি-মজ্জা প্রতিস্থাপন (Bone Marrow Transplantation) হল এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভের একমাত্র উপায়। কিন্তু এ চিকিৎসা পদ্ধতি অত্যান্ত ব্যয়বহুল বিধায় আমাদের দেশসহ তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই এর প্রয়োগ সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

যাদের এই রোগ হয়, তারা ভীষণ রক্তস্বল্পতায় ভোগে। এজন্য তাদেরকে অবশ্যই নিয়মিতভাবে রক্ত সঞ্চালন (Regular Blood Transfusion) করতে হবে। সাধারণতঃ রক্তে যে লোহিত কণিকা (RBC) থাকে, তা একটি নির্দিষ্ট সময় পর ভেঙ্গে যায় এবং লৌহ (Iron) বের হয়ে আসে। যেহেতু এই রোগীদেরকে নিয়মিতভাবে রক্ত গ্রহণ করতে হয়, তাই তাদের রক্তে লৌহের (Iron) পরিমাণ আস্তে আস্তে বেড়ে যায় এবং তা পরবর্তীতে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যথা হৃদপিন্ড (Heart), যকৃৎ (Liver), প্লীহা (Spleen), অগ্ন্যাশয় (Pancreas) এবং অন্যান্য জায়গায় জমা হয়ে ক্ষতি সাধন করে। এজন্য এই রোগীদের অবশ্যই লৌহ অপসারণকারী ঔষধ (Iron Chelating Agent) গ্রহণ করতে হবে। এই ঔষধ শরীরের অতিরিক্ত লৌহ প্রস্রাব ও পায়খানার মধ্যে দিয়ে বের করে দেয়।

নিম্নলিখিত লৌহ অপসারণকারী (Iron Chelating Agent) ঔষধ সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়।

১) **ডেসফেরিঅক্সামিন (Desferrioxamine) :**

এটা ইনজেকশন (Injection) আকারে পাওয়া যায়। এটা সপ্তাহে ৫-৬ দিন ত্বকের নীচে ধীরে ধীরে (Slow Subcutaneous Injection, Using an Injection Pump) ৮-১২ ঘন্টা সময়ব্যাপী প্রয়োগ করতে হবে। বাজারে ডেসফেরাল (Desferal) নামে পাওয়া যায়।

২) **ডিফেরিপ্রন (Deferiprone) :** এটা সেবনকারী (Oral Chelating agent) ঔষধ। বাজারে কেলফার (Kelfer) এবং জিপিও এল ওয়ান (GPO-L-One) নামে পাওয়া যায়।

৩) **ডিফেরাসিরক্স (Deferasirox) :** এটাও সেবনকারী ঔষধ এবং দিনে একবার খেতে হয়। বাজারে দুই নামে পাওয়া যায় - (ক) আসুনরা (Asunra), (খ) ডেসিরক্স (Desirox)

প্লীহা অপসারণ (Splenectomy)

কখনও কখনও থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের রক্ত গ্রহণের মাত্রা (Frequency of transfusion) ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং প্লীহাও (Spleen) অতিমাত্রায় বেড়ে যায়, য়ার ফলে এদের শরীরের লোহিত রক্ত কণিকা(RBC) আরও তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যায়। সেক্ষেত্রে প্লীহা (Spleen) অপসারণ (Splenectomy) করলে ফলপ্রসু উপকার পাওয়া যায়। তবে সাধারণত প্লীহা ৫ বৎসর বয়সে অপসারণ করা হয়। তার আগে করা হয় না, কারণ তাহলে মারাত্মক ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন (Bacterial Infection) হবার সম্ভাবনা থাকে।

যে সমস্ত থ্যালাসেমিয়া রোগীদের প্লীহা অপসারণ করার প্রয়োজন, তাদেরকে অবশ্যই অপারেশনের পূর্বে টিকা দিতে হবে। যে সমস্ত টিকা দেওয়া হয় তা নীচে দেওয়া হল-

১। নিউমোকক্কাল টিকা (Pneumoccal Vaccine)- এই টিকা প্লীহা অপসারণের ২ সপ্তাহ পূর্বে দিতে হবে এবং তারপর প্রতি ৩ থেকে ৫ বৎসর পর পর দিতে হয়।

২। হেমোফাইলাস ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জি টিকা (Haemophilus influenzae Vaccine)- এই টিকাও প্লীহা অপসারণের ২ সপ্তাহ পূর্বে দিতে হবে।

৩। মেনিনগোকক্কাল টিকা (Meningococcal Vaccine)- এই টিকাও প্লীহা অপসারণের ২ সপ্তাহ পূর্বে দিতে হবে।

৪। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস টিকা (Influenza Virus Vaccine)- এই টিকাও প্লীহা অপসারণের ২ সপ্তাহ পূর্বে দিতে হবে এবং তারপর প্রতি ১ বছর পর পর দিতে হবে।।

ইনফিউশান পাম্প (Infusion pump) দিয়ে ডেসফেরাল (Desferal) ইনজেকশান শরীরের কোন্ কোন্ জায়গায় দেওয়া যেতে পারে, তার ছবি নীচে দেখানো হল-

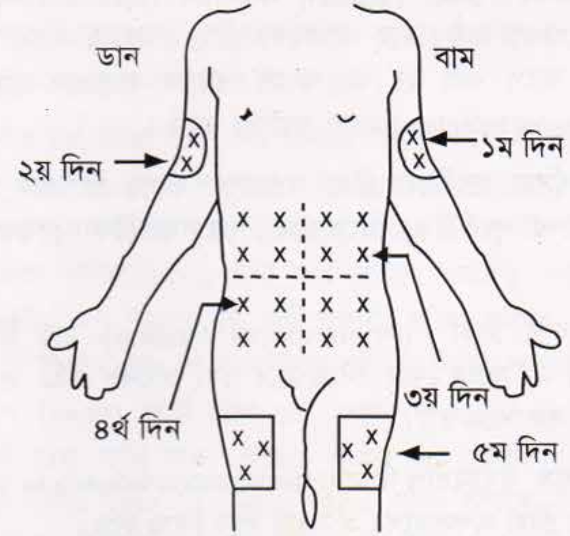

ইনফিউশান (Infusion) দেওয়ার সময় নিচের নিয়মগুলো মেনে চলা উচিত ঃ

১। প্রতিমাসে ডেসফেরাল ইনজেকশান নেওয়ার জন্য এই ছবি নতুন করে তৈরী করে নিতে হবে।

২। সাধারণত ঃ যে সমস্ত জায়গায় ইনফিউশান নেওয়া যায় তা হল পেট (Abdomen), উরু(Thigh) এবং বাহুর(Arm) উপরের অংশে।

৩। প্রত্যেক দিন ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ইন্‌ফিউশান নিবে।

৪। ছবিতে যে ভাবে দেখানো হয়েছে, ঠিক সেভাবে মাসের কোন তারিখে (Date) এবং কোন্ জায়গায় (Site) ইন্‌ফিউশান নিবে তা ছবির গায়ে লিখে রাখবে।

৫। সারামাস ধরে ইনফিউশান দিবার স্থান সমূহ চক্রকারে বদল করে নিতে হবে।

উপরোক্ত নিয়ম অনুসরণ করে ইন্‌ফিউশান পাম্প (Infusion pump) দিয়ে ডেসফেরাল (Desferal) ইন্‌জেক্‌শান দিলে চামড়ায় ক্ষত কম হবে এবং ঔষধও শোষণ (Absorption) ঠিকমত হবে।

বিঃদ্রঃ ডেসফেরাল পাউডার ডিসটিল ওয়াটার (Distilled Water) দিয়ে গুলানোর (Dissolve) পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে শরীরে পুশ (Push) করতে হবে। যদি ২৪ ঘন্টার বেশী হয় তবে কোন ক্রমেই ব্যবহার করা যাবে না।

থ্যালাসিমিয়া রোগীরা কখন নিয়মিত রক্ত গ্রহণ শুরু করবে ?

থ্যালাসিমিয়া রোগীরা কখন রক্ত গ্রহণ শুরু করবে তা নির্ভর করবে তারা কোন ধরনের থ্যালাসিমিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে তার উপরে।

যারা বিটা থ্যালাসিমিয়া মেজর (Beta Thalassaemia Major) এবং সিভীয়ার হিমোগ্লোবিন-ই বিটা থ্যালাসিমিয়া (Severe Hb E Beta Thalassaemia) হিসাবে ডায়াগনোসিস (Diagnosis) হবে তারা সব সময় রক্ত সঞ্চালনের (Blood Transfusion) উপর নির্ভরশীল। কারণ তাদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ৩-৫ গ্রাম/ডিসি লিটার এ নেমে আসে। সেই জন্য তারা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন নিয়মিত রক্ত গ্রহণ করবে। তাদের রক্ত সঞ্চালনের একটা সুনির্দিষ্ট সময়সূচী সাধারণত ২ সপ্তাহ থেকে ৫ সপ্তাহের মধ্যে নির্ধারিণ করা প্রয়োজন যাতে তারা রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ৯-১০.৫ গ্রাম/ডিসি লিটার এর উপর রাখতে পারে।

যারা থ্যালাসিমিয়া ইন্টারমিডিয়া (Thalassaemia Intermedia) এবং মডারেট হিমোগ্লোবিন-ই-বিটা থ্যালাসিমিয়া (Moderate Hb E Beta Thalassaemia) হিসাবে ডায়াগনোসিস হবে, তাদের সব সময় রক্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। তারা কখন রক্ত গ্রহণ শুরু করবে তা মাঝে মাঝে স্থির করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে নীচের উপসর্গগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১। **রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ (The Haemoglobin level)**ঃ যদি শিশুর রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ৭ গ্রাম /ডেসিলিটার (7gm/dl) অথবা ৫০% এর উপর স্থায়ীভাবে না থাকে তবে নিয়মিত রক্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২। **শিশুর বৃদ্ধি (The Child's Growth)** : থ্যালাসিমিয়া রোগীদের বৃদ্ধি ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য নিয়মিত গ্রোথ্ চার্ট (Growth Chart) পর্যবেৰণ করা প্রয়োজন। যদি শিশুর বৃদ্ধি ঠিকমত না হয় তখন রক্ত সঞ্চালন করা প্রয়োজন।

৩। **অস্থির পরিবর্তন (Bone Changes)** ঃ যদি মুখমন্ডলের পরিবর্তন (Thalassaemic Facies) হয় কিংবা অস্থি ভেঙ্গে (Fracture) যায় তবে নিয়মিত রক্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪। হৃৎপিন্ডে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (Cardiac complication) দেখা দিলে।

৫। স্বাভাবিক শারীরিক কার্যক্ষমতা কমে গেলে।

এখানে উল্লেখ্য যে, রক্ত সঞ্চালন পদ্ধতি দেরী করে শুরু করা ঠিক নয়। তার ফলে যে সমস্ত শারীরিক পরিবর্তন হবে তা আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে না।

প্রতিবার রক্ত গ্রহণের সময় মোট কতটুকু রক্তের প্রয়োজন ?

এটা নির্ভর করে রোগী কত সপ্তাহ পর পর রক্ত গ্রহণ করছে তার উপর। সাধারণত থ্যালাসিমিয়া রোগীদের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ সপ্তাহে ১ গ্রাম / ডেসি লিটার (৭%) করে কমতে থাকে। ফলে এইসব রোগীদের যদি ৪ সপ্তাহ পর পর রক্ত সঞ্চালন করা হয় তবে তাদের শরীরে যে হিমোগ্লোবিনের ঘাটতির (৪ গ্রাম/ডেসি লিটার) সৃষ্টি হয় তা পূরণ করতে যথেষ্ট পরিমাণ রক্তের প্রয়োজন পড়ে। যথা-

১ গ্রাম/ডেসি লিটার (৭%) হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি করতে প্রতি কেজি শারীরিক ওজনের (1 kg body weight) জন্য ৩ মিলি লিটার (3 ml) ঘনীভূত লোহিত কণিকা (Packed Red Cell) অথবা ৫ মিলি লিটার (5 ml) সম্পূর্ণ রক্তের (Whole Blood) প্রয়োজন হয়। তাহলে ৪ গ্রাম / ডেসি লিটার (২৮%) হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি করতে প্রতি কেজি শারীরিক ওজনের জন্য ১২ মিলিলিটার (4x3=12ml) ঘণীভূত লোহিত কণিকা (Packed Red Cell) অথবা ২০ মিলি লিটার (4x5=20 ml) সম্পূর্ণ রক্তের (Whole Blood) প্রয়োজন হয়।

উদাহরণ স্বরূপ - যদি একজন রোগীর ওজন ২০ কেজি (২০ শম) হয় তবে ৪ গ্রাম/ডেসি লিটার (4 gm/dl) হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি করতে মোট ঘনীভূত লোহিত কণিকার (Packed Red Cell) প্রয়োজন পড়বে ২৪০ মিলিলিটার (20x 12= 240 ml) অথবা সম্পূর্ণ রক্তের (Whole Blood) প্রয়োজন পড়বে ৪০০ মিলি লিটার (20x 20=400ml)।

একক রক্ত সঞ্চালনের(Single Blood Transfusion) সময় প্রতিটি রোগীকে তার প্রতি কেজি শারীরিক ওজনের জন্য কতটুকু ঘনীভূত লোহিত কণিকা প্রদান করা নিরাপদ ? সাধারণত থ্যালাসিমিয়া রোগীকে তার প্রতি কেজি শারীরিক ওজনের জন্য ১০-১৫ মিলি লিটার ঘনীভূত রক্ত ৩-৪ ঘন্টা ধরে দিতে হবে। তবে যদি রোগীর রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ৫ গ্রাম / ডেসি লিটার এর নীচে নেমে আসে কিংবা হৃদরোগ (Heart disease) থাকে অথবা হৃদপিন্ডের কার্যক্ষমতা কমে যায় তবে প্রতি কেজি শারীরিক ওজনের জন্য ঘন্টায় ২-৫ মিলি লিটার ঘনীভূত রক্ত ধীরে ধীরে শরীরে দিতে হবে।

সিরাম ফেরিটিন (Serum Ferritin)

থ্যালাসিমিয়া রোগীদের সিরামে (Serum) বিভিন্ন পরিমাণে ফেরিটিন (Ferritin) পাওয়া যায় - এই ফেরিটিন সিরামে কতটুকু থাকলে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে নীচে তালিকা (Table) করে দেখান হল ঃ

সিরাম ফেরিটিন, ন্যানো গ্রাম/মিলি লিটার (Serum Ferritin, ng/ml)	কি বুঝায় ? (What it means)
১। ১,০০০ এর নীচে	১। সম্ভবত রোগী খুব বেশী পরিমাণে লৌহ অপসরনকারী ঔষধ (Iron chelating agent) নিচ্ছে কিংবা সিরাম ফেরিটিনের পরিমাণ খুব কম।
২। ১,০০০ থেকে ২০০০	১। সম্ভবত রোগী ঠিকমত চিকিৎসা নিচ্ছে সেই জন্য ফেরিটিন এর পরিমাণ গ্রহণযোগ্য মাত্রায় আছে।
৩। ২,০০০ থেকে ৪,০০০	৩। একটু বেশী পরিমাণে ফেরিটিন আছে, কিন্তু বিপদজনক নয়। চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।
৪। ৪,০০০ থেকে ৭,০০০	৪। ফেরিটিন খুব বেশী পরিমাণে আছে- জীবন যাপনে অসুবিধা হবে। যেমন- শিশুর বৃদ্ধি, যৌবন প্রাপ্তি ইত্যাদিতে ব্যাঘাত ঘটবে এবং বিভিন্ন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (Complications) দেখা দিবে।
৫। ৭,০০০ এর উপরে	৫। ফেরিটিনের পরিমাণ বিপদের সংকেত দিচ্ছে।
৬। ১০,০০০ এর উপরে	৬। সত্যিকার অর্থে ফেরিটিন বিপদজনক মাত্রায় আছে, জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রয়োজন।

যারা হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার এর বাহক কিংবা অসুখে আক্রান্ত, তাদের লৌহ (Iron) দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে কিনা ?

না, তাদের কোন মতেই লৌহ দেওয়া যাবে না। তারা যে রক্ত শূন্যতায় ভুগে তা রৌহের অভাবে হয় না। ফলে লৌহ দিলে শরীরের লাভ তো হবেই না বরং ক্ষতিই হবে বেশী। এই লৌহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যথা যকৃৎ, হৃৎপিন্ড এবং অন্যান্য জায়গায় ধীরে ধীরে জমা হয়ে ক্ষতি সাধন করবে। এই জন্য তাদের খাবারে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন (Vitamin) থাকা উচিত এবং লৌহ সব সময়েই পরিহার করা উচিত। যদি রক্তে বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে যথা সিরাম আয়রন (Serum Iron) এবং সিরাম ফেরিটিন (Serum Ferritin) এর মান নির্ণয় করার পর যদি লৌহ ঘাটতি ধরা পড়ে, তবেই লৌহ সেবন করবে নতুবা নয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, যদি হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার বহনকারী মহিলা গর্ভবর্তী হয়, তবে তাকে স্বাভাবিক গর্ভবর্তী মহিলাকে যে পরিমাণ লৌহ দেওয়া হয়, তাকেও সেই একই পরিমাণ লৌহ দিতে হবে তার গর্ভাবস্থায় স্বাভাবিক ঘাটতি পূরণের জন্য।

হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার কি প্রতিরোধ করা সম্ভব ?

আধুনিক বিশ্বে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে অনেক রোগকে নিরাময় (Cure) এবং অনেক রোগকে প্রতিরোধ (Prevention) করা সম্ভব হয়েছে। এই হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডারও প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিতে হবে-

(১) দেশের প্রতিটি নাগরিককে এই রোগ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এজন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে যেমন রেডিও, টেলিভিশন ও খবরের কাগজ ইত্যাদিতে প্রচার কার্যক্রম চালাতে হবে। তাছাড়া বিশেষ ক্রোড়পত্র, পোষ্টার, লিফলেট ইত্যাদি নিয়মিত বিতরণ করতে হবে। কেননা সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রচারের চেয়ে অন্য কোন বিকল্প নেই।

(২) স্ক্রীনিং টেষ্ট (Screening Test) এবং অন্যান্য পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে যারা হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার এর বাহক হিসাবে চিহ্নিত হবে তাদের প্রত্যেককে বংশ বিষয়ক পরামর্শ (Genetic Counselling) দিতে হবে।

(৩) হিমোগ্লোবিন-ডিসঅর্ডার বহনকারী মহিলারা যদি গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসবের অনেক আগেই বিশেষ ধরনের পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা যায় সন্তান সুস্থ হবে নাকি থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত হবে। এই পরীক্ষাকে "প্রি-নেটাল ডায়াগনোসিস" (Pre-Natal Diagnosis) বলে। এই পরীক্ষার ফলে যদি দেখা যায় সন্তান থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে, তবে তারা আগত সন্তানের মারাত্মক পরিণতির কথা চিন্তা করে তা গর্ভপাত (Therapeutic abortion) করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে আক্রান্ত সন্তান প্রতিরোধ করা সম্ভব।

যদি উপরোল্লিখিত পদক্ষেপ আমাদের দেশে নেওয়া হয়, তবে হয়তো একদিন আমাদের দেশ থেকে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যে সাইপ্রাসে এক সময় থ্যালাসিমিয়া খুব বেশী ছিল, উপযুক্ত প্রচার এবং প্রতিরোধের ফলে তা আজ প্রায় শূণ্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

উপদেশ (Advice) এবং বংশ বিষয়ক পরামর্শ (Genetic Counselling)

যে সমস্ত পরিবার হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার এর বাহক কিংবা রোগে আক্রান্ত, তাদের নিম্নলিখিত পরামর্শগুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং সম্ভব হলে তা মেনে চলতে চেষ্টা করা উচিত।

১। হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার (Hb-Disorder) বংশগত রোগ। পিতা-মাতা থেকে সন্তানদের মধ্যে জিনের (Gene) মাধ্যমে প্রবেশ করে। যে বংশে এই ডিসঅর্ডার থাকে, সেই বংশের লোকজনই বংশানুক্রমে এটা বহন করে।

২। যে পরিবারে হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার আছে সেই পরিবারের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সবাইকে হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরেসিস (Hb Electrophoresis) অথবা (HPLC) করার জন্য পরামর্শ দিতে হবে।

৩। যারা হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার এর বাহক, তাদের নিজের বংশের কাউকে জীবনসঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করা উচিত হবে না, যাকে জীবনসঙ্গী হিসাবে বেছে নিবে সে সেত্রেও সাবধানতা অবলম্বন করা শ্রেয় - সম্ভব হলে বিবাহ পূর্বে রক্ত পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিবে, তারা হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার থেকে মুক্ত কিনা।

৪। মনে রাখতে হবে, যারা হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার এর বাহক তারা যদি অন্য হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার বহনকারী কাউকে বিবাহ করে তবে রোগাক্রান্ত সন্তান জন্ম হওয়ার আশংকা থাকে। এই কারণেই তাদের উচিত হবে সুস্থ কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। তাহলে রোগাক্রান্ত সন্তান জন্ম হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

৫। যদি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার এর বাহক হয় এবং স্ত্রী যদি গর্ভবর্তী হয়, "প্রি-নেটাল ডায়াগনোসিস" (Pre-Natal Diagnosis) করার জন্য পরামর্শ দিতে হবে।

প্রি-নেটাল ডায়াগনোসিস (Pre-Natal Diagnosis) ঃ

শিশু যখন মাতৃ জঠরে (Mother's Womb) থাকে তখন সন্তান প্রসবের অনেক আগে ভ্রূণ (Embryo) পরীৰার দ্বারা বলে দেওয়া যায় শিশু থ্যালাসিমিয়া রোগে আক্রান্ত কিনা? এই পরীক্ষাকে প্রি-নেটাল ডায়াগনোসিস বলে।

এই পরীক্ষা করা হয় যখন স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই থ্যালাসিমিয়িা বাহক হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বামী কিংবা স্ত্রীর একজন বাহক এবং অন্যজন সুস্থ হলে এই পরীক্ষা করার দরকার পড়ে না।

ভ্রূণে থ্যালাসিমিয়া নির্ণয় দুই রকম ভাবে করা যেতে পারে ঃ

১। কোরিওনিক ভিলাই পরীক্ষা (Chorionic Villi Sampling)

২। মাতৃ জঠরে পানি পরীক্ষা (Amniocentesis)

১। কোরিওনিক ভিলাই পরীক্ষা (Chorionic Villi Sampling) ঃ

এই পরীক্ষা করা হয় মায়ের গর্ভাবস্থার ১০ থেকে ১১ সপ্তাহের মধ্যে। এখানে আল্ট্রাসনোগ্রাফির সাহায্যে অল্প একটু কোরিওনিক ভিলাই (Chorionic Villi) সংগ্রহ করা হয়। এটা দুই রকম ভাবে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ক। ট্রান্সএ্যাবডোমিনাল (Transabdominal) - এই পথে একটি সরব সূঁচ মায়ের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে কোরিওনিক ভিলাই সংগ্রহ করা হয়।

খ। ট্রান্সসারভাইকাল (Trancervical) - এখানে যৌনিপথে একটি ক্যাথেটার (Catheter) ঢুকিয়ে কোরিওনিক ভিলাই সংগ্রহ করা হয়।

তারপর ল্যাবরেটরীতে এই টিস্যু (Tissue) বিশ্লেষণ করে বলে দেওয়া যায় ভ্রুণটি থ্যালাসিমিয়া রোগে আক্রান্ত কিনা? এই পদ্ধতিতে সামান্য কিছু ঝুঁকি রয়েছে যথা-গর্ভপাত ২% পর্যন্ত। রক্ত ক্ষরণ (Bleeding) ও প্রদাহ (Infection) হতে পারে- তার ঝুঁকিও কম।

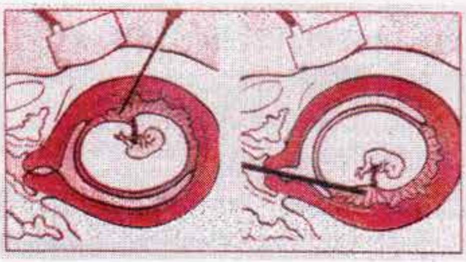

Chorionic Villi Sampling
কোরিওনিক ভিলাই সংগ্রহ

২। মাতৃ জঠরে পানি পরীক্ষা (Amniocentesis) :

এই পরীক্ষা করা হয় মায়ের গর্ভাবস্থার ১৫ সপ্তাহ পরে। আল্ট্রসনোগ্রাফির সাহায্যে ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ (Obstetrician) মায়ের পেটে একটি সরু সূঁচ (যার সাথে সিরিঞ্জ সংযুক্ত থাকে) ঢুকিয়ে জঠরের পানি সংগ্রহ করে। এই পানির মধ্যে ভ্রুণের কোষ (Cell) থাকে। ল্যাবরেটরীতে এই পানি থেকে কোষ আলাদা করে এবং তা বিশ্লেষণ (Analysis) করে বলে দেওয়া যায় ভ্রুণে থ্যালাসিমিয়া রোগ আছে কিনা ? এই পদ্ধতিতে কিছুটা গর্বপাতের (Abortion) ঝুঁকি থাকলেও শতকরা হিসাবে খুবই কম যথা ০.৫% এর নীচে।

Amniocentesis
মাতৃ জঠরে পানি সংগ্রহ

উপরোক্ত পরীক্ষার ফলে বলে দেওয়া যায় ভ্রুণটি সুস্থ হবে, নাকি বাহক হবে, নাকি থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত হবে ? যদি ভ্রুণটি সুস্থ অথবা বাহক হয় তবে গর্ভাবস্থা বজায় রাখবে। আর যদি থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত হয় তবে আগত সন্তানের মারাত্মক পরিণতির কথা চিন্তা করে তা গর্ভপাত (Abortion) করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এটা দম্পতির সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার। তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিবে কি করবে? গর্ভাবস্থা বজায় রাখবে, নাকি গর্ভপাত করবে ?

থ্যালাসিমিয়া রোগীর খাদ্য

যে সমস্ত খাবারে অধিক পরিমাণ লৌহ (High iron diet) আছে, সেই সমস্ত খাবার অবশ্যই পরিহার করা এবং যে সমস্ত খাবারে কম পরিমাণ লৌহ (Low iron diet) আছে, সেই সমস্ত খাবার খেতে হবে। তাই থ্যালাসিমিয়া রোগীরা কোন ধরনের খাবার খাবে তা নীচের খাদ্য তালিকা থেকে কম লৌহ যুক্ত খাবার বেছে নেবে ঃ

খাদ্য সামগ্রীর নাম	অধিক লৌহযুক্ত খাবার (High iron diet)	কম লৌহযুক্ত খাবার (Low iron diet)
১। মাংস ও মাংস জাতীয় খাবার	গরুর মাংস, খাসীর মাংস, কলিজা, ডিমের কুসুম, ইলিশ, কৈ, চিংড়ি, চিতল, সিঙ্গি, টেংরা ও ছোট মাছের শুটকি	রুই, কাতল, পাংগাস, বোয়াল, মাগুর, সরপুঁটি সোল ও বাচা মাছ, ডিমের সাদা অংশ।
২। শাক্ সবজি	কচুশাক, লালশাক, পালংশাক, পুঁইশাক, ফুলকপি শাক, পুদিনা পাতা, ধনে পাতা ফুলকপি, সিম, বরবটি, মটরশুঁটি, কাকরোল কাঁচা পেঁপে, সাজনা, কাঁচা টমেটো।	বাঁধাকপি, মিষ্টি আলু, করলা, মিষ্টি কুমড়া ঢেড়স, মূলা, শালগম, কাঁচাকলা, ঝিংগা পাকা টমেটো, লাউ, চাল কুমড়া।
৩। ফল	আনারস, বেদানা, শরিফা, খেজুর, তরমুজ	পাকা আম, লিচু, পেয়ারা, কলা, পাকা পেঁপে, কমলালেবু, আপেল, বেল, জামরুল, আতা, আমলকি, কাগজী লেবু, আঙ্গুর।
৪। খাদ্য শষ্য এবং তা থেকে তৈরী খাবার	খৈ, কর্ন ফ্লেক্স (Corn flakes), শিশু খাদ্য, যেখানে লৌহ সংযুক্ত করা আছে যেমন - সেরিল্যাক (Cerelac) কৌটার দুধ ইত্যাদি	চাল, ময়দা, পাউরুটি
৫। ডাল	ছোলা, ছোলার ডাল	মসুর ডাল
৬। বিবিধ	গুড়, বাদাম (Almonds), চীনাবাদাম, কিসমিস, তিল, পান, জিরা, ধনে, সরিষা	মধু, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার যথা-দই, ছানা পনির, রসগোল্লা ইত্যাদি।

থ্যালাসিমিয়া রোগীরা যদি উপরে বর্ণিত খাদ্য তালিকা অনুসরণ করে খাদ্য গ্রহণ করে এবং নিম্নে বর্ণিত নিয়ামাবলী মেনে চলে, তবে অন্ত্র (Intestine) থেকে লৌহ শোষণের (Iron absorption) পরিমাণ অনেকাংশে কমিয়ে ফেলা সম্ভব-

১। যে সমস্ত খাবারে কম পরিমাণ লৌহ আছে (তালিকা দেখুন), তা অবশ্যই খেতে হবে।

২। যে সমস্ত খাবারে অধিক পরিমাণ লৌহ আছে (তালিকা দেখুন), তা নিয়মিতভাবে পরিহার করতে হবে।

৩। খাবার লোহার পাত্রে রান্না করা চলবে না, কারণ তাহলে খাবারে লোহার পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে।

৪। তিনবেলা (নাস্তা, দুপুরে ও রাত্রে) খাবারের পর পর চিনি ছাড়া চা, কফি, দুধ বা টক দই অবশ্যই খেতে হবে। চা, দুধ বা টক দই খাবারের সাথে বা পর পর খেলে খাবারে যে লৌহ আছে তা অন্ত্র হতে শোষণে (Absorption) বাধা দেয়। চা এর মধ্যে ট্যানিক এসিড (Tannic acid) আছে- তা নন-হীম লৌহের (Non-haem iron) সাথে সংযুক্ত হয়ে এক জটিল বস্তু তৈরী করে যা অন্ত্র থেকে শোষণ হতে পারে না। অন্য দিকে দুধের মধ্যে ফসফেট (Phosphate) আছে যা খাবারের লৌহের সাথে সংযুক্ত হয়ে অদ্রবণীয় ফেরিক ফসফেট (Insoluble ferric phosphate) তৈরী করে এবং লৌহ শোষণ হতে পারে না।

৫। খাবারের সাথে বা পর পর 'ফল' খাওয়া চলবে না। ফলে খেতে হলে তা দুই খাবারের মাঝে খেতে হবে। অর্থাৎ সকালের নাস্তা এবং দুপুরের খাবারের মাঝখানে অথবা দুপুরের খাবার এবং রাতের খাবারের মাঝখানে। ফলের মধ্যে ভিটামিন সি (Vitamin C) আছে যা খাবারের ফেরিক লৌহকে (Ferric iron) ফেরাস লৌহতে (Ferrous iron) রূপান্তরিত করে এবং অন্ত্র থেকে সহজেই লৌহ শোষণ হতে সাহায্য করে।

৬। চিনি ও মিষ্টি জাতীয় খাবারও খাবারের সাথে খাওয়া চলবে না। দুই খাবারের মাঝখানে খেতে হবে। চিনি ও মিষ্টি খাবারের সাথে খেলে বেশী পরিমানে লৌহ শোষণ হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, ফল ও মিষ্টি কোন খাবারের সাথেই খাওয়া যাবে না। সব সময়ই আলাদাভাবে খেতে হবে।

থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত রোগীদের করণীয় ঃ

১। নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা(Blood Test) করানো।

২। যে সমস্ত থ্যালাসিমিয়া রোগী রক্ত সঞ্চালনের (Blood Transfusion) উপর নির্ভরশীল তাদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ৯-১০.৫ গ্রাম/ডেসিলিটার এর উপর রাখতে হবে।

৩। যে সমস্ত থ্যালাসিমিয়া রোগীদের মাঝে মাঝে রক্ত নেওয়ার দরকার হয় (Thalassaemia Intermedia), তাদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ সাধারণতঃ ৭ গ্রাম/ডেসিলিটার রাখার চেষ্টা করতে হবে।

৪। রক্ত প্রদানের একটি সময়কাল (সাধারণত ২ থেকে ৫ সপ্তাহ) নির্ধারণ করা।

৫। রক্ত প্রদানের তারিখ, পরিমাণ এবং রক্ত প্রদানের পূর্বে ও পরে হিমোগ্লোবিনের (Hb) এর মান নির্ণয় করা।

৬। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস (Hepatitis B Virus) এর টিকা দেয়া।

৭। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর রোগীর উচ্চতা, ওজন, লিভার ফাংশন টেষ্ট (Liver Function Tests) ইত্যাদি পরীক্ষা করানো।

৮। প্রথম ১০ থেকে ২০ বার রক্ত দেওয়ার পর অথবা রক্তে সিরাম (Serum Ferritin) এর মান ১০০০ ন্যানোগ্রাম / মিলিলিটার (>1000 ng/ml) এর বেশী হলে রোগীকে অবশ্যই লৌহ অপসারকারী ঔষধ (Iron Chelating Agents) যথা ডেসফেরাল (Desferal) ইন্‌জেক্‌শন অথবা কেলফার বড়ি (Kelfer Tablet) অথবা ডিফেরাসিরক্স (Deferasirox) বড়ি সেবন করা দরকার। নতুবা শিশু স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠবে না। অন্যদিকে এই অতিরিক্ত লৌহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় যেমন যকৃৎ (Liver), হৃদপিন্ড (Heart) ও অন্যান্য জায়গায় ধীরে ধীরে জমা হয়ে পরবর্তীতে বিভিন্ন জটিল উপসর্গ দেখা দিবে।

৯। এক বছর অন্তর অন্তর শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ পর্যবেণ করা।

১০। প্রয়োজনে এবং উপসর্গ অনুসারে ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেষ্ট (Oral glucose tolerance test), রেনাল ফাংশন টেষ্ট (Renal Function Tests), হৃদপিন্ড ও অন্যান্য এন্ডোক্রাইনোলজিক্যাল (Endocrinological) পরীক্ষা করা।

উপসংহার ঃ

থ্যালাসিমিয়া রোগীদের চিকিৎসা অন্যান্য সংক্রমক অসুখ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অন্যান্য সংক্রামক অসুখে রোগীরা চিকিৎসা নিলে সাধারণত সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু থ্যালাসিমিয়া রোগীরা নিয়মিত রক্ত সঞ্চালন করলে এবং লৌহ অপসারণকারী ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা নিলে সুস্থ থাকে, অনেক দিন পর্যন্ত বাচেঁ- কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হয় না। তবে রক্ত সঞ্চালন এবং লৌহ অপসারণকারী ঔষধই তাদের একমাত্র চিকিৎসা নয়। সেই সাথে সাথে অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ প্রয়োজন। যে সমস্ত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ বেশী প্রয়োজন তারা হলেন রক্তরোগ, হৃদরোগ, হরমোন, মনোরোগ ও শল্যবিদ্যা বিশেষজ্ঞ। এছাড়া হাসপাতালে থ্যালাসিমিয়া রোগীদের সার্বক্ষনিক সেবা প্রদান করার জন্য দরকার নিষ্ঠাবান নার্স ও সমাজ কর্মী। এই কারণে ঢাকা শিশু হাসপাতালের অভ্যন্তরে ঢাকা শিশু হাসপাতাল থ্যালাসিমিয়া সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৯৮ সালে- যার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে।

এই সেন্টারের মূল লক্ষ্য হল থ্যালাসিমিয়া মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার। তাই দেশের প্রতিটি নাগরিককে এই রোগ সম্বন্ধে জানতে হবে। এটা কোন কঠিন কাজ নয়- শুধু দরকার সচেতনতা। তবেই এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই লক্ষ্যেই ঢাকা শিশু হাসপাতাল থ্যালাসিমিয়া সেন্টার কাজ করে যাচ্ছে। আশা করি আমরা এক দিন সফলকাম হবই হব। তাই আমাদের শ্লোগান হল----

থ্যালাসিমিয়া রোগ
আমরা সবাই মিলে করবো প্রতিরোধ।

ঢাকা শিশু হাসপাতাল
থ্যালাসিমিয়া সেন্টার

যে কেউ থ্যালাসিমিয়া রোগের বাহক হতে পারে
-আপনি বাহক কিনা রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নিন

আপনার দেয়া এক ব্যাগ রক্তই থ্যালাসিমিয়া আক্রান্ত
শিশুর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবে।

থ্যালাসিমিয়া রোগের চিকিৎসা অত্যান্ত ব্যয়বহুল সুতরাং
প্রতিরোধই এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায়।

বংশ বিষয়ক পরামর্শ দ্বারা থ্যালাসিমিয়া রোগ
প্রতিরোধ করা সম্ভব।

থ্যালাসিমিয়া রোগেরা যদি নিয়মিত রক্ত নেয় এবং সেই সাথে
লৌহ অপসারকারী ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করে তবে প্রায়
স্বাভাবিকভাবে দিন যাপন করবে।

DSHTC
ঢাকা শিশু হাসপাতাল থ্যালাসিমিয়া সেন্টার
Dhaka Shishu Hospital Thalassaemia Centre